প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৫

প্রচ্ছদ ও বিন্যাস   প্রণবেশ মাইতি

প্রকাশক . সুভাষ চন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০৭৩

চিত্রাঙ্কন বিন্যাস
সুপার কমিউনিকেটরস প্রাইভেট লিমিটেড
১২, বি বা দী বাগ, কলিকাতা-৭০০ ০০১

মুদ্রক   স্বপন কুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০৭৩

উত্তীয় ও মেধা-কে

বাবা

RABI THAKUR KABITHAKUR

By

SUNIL JANA

Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta-700 073

ছোটদের জন্য লেখকের অন্যান্য বই

মা দুর্গা এ্যাণ্ড কোং
নিত্যকালের গল্প কথা
ক্ষুদিরামের ফাঁসি
আধখানা ভূত
বলে গেছেন বিষ্ণু শর্মা
বাঘের মুখ
হবু-গবু (কিশোর নাটিকা)

গগনে গগনে নবনব দেশে রবি
নব প্রাতে জাগে নূতন জনম লভি ॥



১

এক যে ছিলেন রবিঠাকুর,
রবি কিংবা কবি ঠাকুর।
ছিলেন তো নয়, আজো আছেন,
তোমার আমার মধ্যে বাঁচেন।
একশো দুশো তিনশো বছর
যাক না কেটে, কবি অমর।
রবির আলোয় কবির গানে
আমরা খুঁজি বাঁচার মানে।
তাঁর চোখেই চেয়ে দেখি,
তাঁরই ভাবে ভাবতে শিখি।
তাঁর কথাতেই কাঁদি হাসি,
গান গাই আর ভালোবাসি।
যেমন আলো, যেমন হাওয়া
তেমনি করেই তাঁকে পাওয়া।
মনের মধ্যে টুপুর টাপুর
রবি ঠাকুর কবি ঠাকুর।



২

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি,
দালান কোঠা সারি সারি।
যেমন গুণী তেমনি ধনী,
বাড়ি তো নয়, হিরের খনি।
কতোই হিরে মানিক জ্বলে
ঠাকুরবাড়ির দালান তলে।
লক্ষ্মী এবং সরস্বতী
এক বাড়িতেই মূর্তিমতী।
ধর্মে বা কেউ কর্মে মহান,
নানান গুণে সব গুণবান।
কেউ পণ্ডিত, কেউ বা কবি,
কেউ লেখেন, কেউ আঁকেন ছবি।
কাব্য নাটক গানের সুরে
লাগলো মাতন বাংলা জুড়ে।
এই বাড়িতেই খুললো দোর
বাংলাদেশের নতুন ভোর।
উঠলো নতুন দিনের রবি,
আলোয় আলোকময় সে কবি।



৩

ঠাকুরবাড়ি গড়লো কে ?
দ্বারকানাথ ঠাকুর সে,
রবিকবির ঠাকুরদা,
সবাই জানে সেই কথা ।
তাঁর আমলেই বাড়লো যশ,
লক্ষ্মী হলেন তাঁদের বশ ।
ধনে মানে দিনকে দিন
দ্বারকানাথ তুলনাহীন ।
নাম খ্যাতিতে ভরলো দেশ,
দান-ধ্যানেরও নেইকো শেষ ।
বুক ফুলিয়ে বিলেত যান,
সবার কাছে কি সম্মান !
সাহেব সুবোর লাগলো তাক্ ।
প্রিন্স্ বলে কি নামডাক !
সেদিন আর কে জানতো,
এই দুনিয়ার দু'প্রান্ত
তাঁরই নাতি করবে জয় !
নাম ছড়াবে বিশ্বময় ।



৪

ধনীর দুলাল দেবেন্দ্রনাথ,
ধনদৌলত ভরা
ঠাকুরবাড়ির মধ্যে যেন
অন্যভাবে গড়া।
ভোগবিলাসে মন লাগে না,
উপনিষদ বাণী
ঈশ্বরেরই বার্তা তাঁহার
চিত্তে দিল আনি।
পাঁজি পুরুত পুতুল পুজো
সব কিছু ত্যাগ করে
নিরাকার এক অদ্বিতীয়
ব্রহ্মকে ধ্যান করেন।
সংসারেতে বাস করেও
যেন পরম ঋষি,
'মহর্ষি' তাই বলে সবাই
শত্রুমিত্র মিশি।
ইনি কবির 'বাবামশাই',
মা সারদা দেবী।
ছয় মেয়ে আর নয়টি ছেলে,
সবার সেরা রবি।

৫

ঠাকুরবাড়ি চাঁদের হাট,
রূপে গুণে জমজমাট।
বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ
একাই করেন বাজিমাৎ।
ভারি পণ্ডিত, ভীষণ ভোলা,
সদাশিব আর দিলখোলা।
গুরুগম্ভীর গদ্য লেখেন,
পাকড়ে শোনান, যাকেই দেখেন।
পদ্যতেও যান না কম,
কাব্য ছড়া কতরকম।
অঙ্ক কষে সুরও মাপেন।
তাঁর জ্বালাতে সবাই কাঁপেন ॥

সত্যেন্দ্রনাথ মেজোদাদা
সাদা-কালোর কাটিয়ে বাধা
দেশের প্রথম আই সি এস—
গর্ব করে সারা দেশ ॥

স্বর্ণকুমারী এক সে দিদি,
নয়তো শুধু রূপের নিধি,
গুণেও তিনি যান না কম,
বাঙালী মেয়ে তিনি প্রথম
লেখেন কাব্য উপন্যাস।
নতুন সে এক ইতিহাস ॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—জ্যোতিদাদা,
রবি তো তাঁর সুরেই বাঁধা।
যেমন দাদা, তেমনি ভাই,
এমন জুড়ি কোথাও নাই।
রবির তিনি নতুনদা,
বন্ধু, গুরু আর সখা।
বইয়ে দিলেন রবির প্রাণে
কাব্য নাটক গানে গানে
কল্পলোকের দখিন হাওয়া
ছন্দ-সুরের আসা যাওয়া।
জ্যোতিদাদা তোলেন সুর
পিয়ানোতে কী মধুর।
কথায় রবি বাঁধছে গান,
কাব্য গানের ডাকলো বান।
সেই বানেতে ভাসলো দেশ,
আজো যে তার পাইনে শেষ ॥



৬

রবির যখন জন্ম, তখন
কলকাতাটা
সেকেলে এক আধা শহর
আধা গাঁ-টা ।
ভিড় জমজম লোক গমগম্
ছিল না তো,
চোখ ধাঁধানো ঘরবাড়ি সব
কোথায় অতো !
ছড়িয়ে ছিল শান্তি ভরা
শ্যামল ছায়া,
ভরে ছিল প্রকৃতির ওই
কোমল মায়া ।
দিন কাটতো খোস্ মেজাজে
ঢিমে তালে,
জীবনধারা চলতো বয়ে
দুলকি চালে ।
হয় নি তখন কলিকাতা
কল্লোলিনী,
হাঁসফাঁসিয়ে ছুট্ লাগাবার
দিন আসেনি ।

না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস,
মোটর গাড়ি।
উড়িয়ে ধুলো ছুটতো পথে
হাঁকার ছাড়ি
ঘোড়ায় টানা ছ্যাকরা গাডি
ছড়ছডিয়ে।
চমকে যেতো পথেব লোকে
চলতে গিয়ে।

শহবেতে তখন জলেব
কল বসেনি।
মাঘ-ফাগুনের গঙ্গা থেকে
খাবাব পানি
ঘডা ঘড়া জমাতো লোক
বছব ভোবের।
জোযার এলে গঙ্গাজলে
পথেব ধাবেব
বাঁধানো সব নালাগুলো
উঠতো ভবে,
পুকুবে জল ঝবণাধাবায
পডতো ঝবে।

কোথায তখন গ্যাসেব আলো ?
বিজলি বাতি ?
সন্ধ্যা হলেই শহব জুডে
আঁধা বাতি।
কেরোসিনের আলো এলো
অনেক পবে।
রেড়ির তেলের জ্বলতো পিদিম
ঘরে ঘরে।

টিম্‌টিমে সেই আলোয় আঁধার
ঘন আরো,
ভূত পেতিনী শাকচুন্নির
পোয়া বারো ।
গা ছম্‌ছম্‌ একলা যেতে,
পথের ধারে
এই বুঝি কোন্‌ ব্রহ্মদত্যি
লাফায় ঘাড়ে ।
এক পা বাড়ির কার্ণিসে, আর
এক পা গাছে
কুলোর মত কানওলা কে
দাঁড়িয়ে আছে !
আজগুবি নয়, সাক্ষী তখন
অনেক ছিল ।
এই আধুনিক যুগ এসে সব
উল্‌টে দিল !

৭

যদিও রবি ধনীর দুলাল,
শৈশবে তার গরিবি চাল।
বিলাসিতার আপদ বালাই
কোনোখানে একটুও নাই।
না সাজগোজের কোনো বাহার,
গন্ধটি নাই শৌখিনতার।
গায়ে একটা সাদা জামা,
মোজা পরার নেই হাঙ্গামা।
জুতো জোড়া ছিল বটে,
উঠতো না তা পায়ে মোটে।
পায়ের আগে মেরে ঠেলা
জুতো দিয়ে জমতো খেলা।
শুধু রবির দুঃখুটা এই
জামায় কোনো পকেটই নেই।
দরজি বুড়ো ভারি কৃপণ,
পকেট থাকার কি প্রয়োজন,
বুড়োমানুষ বুঝবে কি আর—
কত কি যে এই দুনিয়ার
কুড়িয়ে পকেট ভরার আছে
ছোট্ট একটা ছেলের কাছে!

তবুও রবি এরই মাঝে
দিব্বি ছিল খোসমেজাজে।
মনটা ছিল পাখ্‌না-মেলা,
নেই কোনো ভার, নেই ঝামেলা।
আদর যত্ন ভালোবাসার
নেইকো জুলুম, না অত্যাচার!
সে এক মস্ত স্বাধীনতা!
কেউ বলতে নেই কোনো কথা।
দেখাশোনার ভার ছোটদের
ছিল বাড়ির ভৃত্যকুলের।
চাকর ভৃত্য পালে পালে,
তারা থাকতো তাদের তালে।
অনাদর আর অবহেলায়
রবির দেদার দিন কেটে যায়।

৮

চাকরের সর্দার
ছিল যে, নামটি তার
শ্রীযুত ব্রজেশ্বর।
কড়া গলাটির স্বর,
মেজাজটা গম্ভীর,
ভঙ্গি মুরুব্বির।
চুল গোঁফ কাঁচাপাকা,
শুকনো চামড়াঢাকা
মুখখানা টানটান।
কিন্তু বেজায় মান!
গ্রামে কোন্ পাঠশালে
কবে যেন এককালে
করতো সে গুরুগিরি,
তাই কি কথার ছিরি
ঈষৎ বাঁকিয়ে ঘাড়
চিবিয়ে চিবিয়ে তার
মুখে সদা সাধুভাষা!
শুনে মুখ টিপে হাসা
ছাড়া আর গতি নাই।
ওদিকেও শুচিবাই
ছিল তার অতিশয়—
দুনিয়া নোংরামিয়!

তারি পরে ছিল ভার
ছেলেদের খাওয়াবার।
বুড়ো ধাড়ি মহাশয়,
লোভ তার কম নয়।
সবার পাতের পরে
একটি একটি করে
দোলাতো ফুল্‌কো লুচি,
শুধাতো, আর দেব কি?
না বললে খুশি হয়,
রবি তাই প্রায়ই কয়—
আর তার চাইনেকো।
ছিল না সে দুধখেকো,
দুধের বাটিও প্রায়
ব্রজর পেটেই যায়।

না খাওয়া রবির রোগ। তার কাছে রাজভোগ
মনে হয় মুড়ি ছোলা, চিনেবাদামের ডেলা,
সস্তার তিলে গজা কিবা স্বাদ, কিবা মজা !

ছেলেদের সামলাতে প্রতিদিন সন্ধ্যাতে
টিমটিমে সেজ জ্বেলে দিব্বি আসর মেলে
পড়তো সে রামায়ণ। সে এক আকর্ষণ
বালক রবির কাছে। তার বেশ মনে আছে—
মিট্‌মিটে আলোটায় ছায়া দেয়ালের গায়,
টিক্‌টিকি পোকা ধরে, চাম্‌চিকে ওড়ে ঘরে।
ব্রজ পড়ে দিয়ে মন সাতকাণ্ড রামায়ণ।
শ্রোতাদের নেই হুঁশ্, আসে বীর লবকুশ।
যুদ্ধে তাদের সাথ বাপ-খুড়ো কুপোকাৎ
মনে পড়ে সেই কথা, ব্রজর সে কথকতা।

৯

ফুটফুটে এক ছোট্ট ছেলে,
    তেমনি আবার ছটফটে।
নিত্যি তাকে সামাল দিতে
    শ্যাম চাকরের ঘাম ছোটে।
ঘরের ভেতর আটকে তাকে
    শ্যাম কেটে দেয় গণ্ডিটা —
খবরদার, এর বাইরে গেলে
    ধরবে সে দশমুণ্ডিটা।
বুক দুরদুর্ ভয় গুরগুর্
    ভাবতো রবি চুপ্ করে,
সীতার মত তাকেও রাবণ
    পাছে আবার না ধরে।
আপন মনে বকবকিয়ে
    ঘুরতো রবি ঘর জুড়ি,
পা টিপ্‌টিপ্ দেখতো খুলে
    জানলাখানার খড়খড়ি।
ঘাটবাঁধানো মস্ত পুকুর,
    ঠিক নিচে তার পাতা ওই
জল-ছল্‌ছল্ নীল টলমল্
    একটা যেন ছবির বই।

কত লোকে আসছে স্নানে,
টুপ্‌ করে কেউ মারছে ডুব,
দু'কানে কেউ আঙুল গুঁজে
ডুব দিচ্ছে ঝুপুস্‌ ঝুপ্‌।
ঘাট থেকে কেউ লাফায় ঝপাং,
গামছা দিয়ে জল তুলে
মাথার উপর ঢালছে বা কেউ,
কাটছে সাঁতার প্রাণ খুলে।
দেখতে দেখতে দুপুর গড়ায়,
ফাঁকা পুকুর ঘাটখানা।
শান্ত নিঝুম প্রায় ঘুমঘুম্‌
চতুর্দিকের ভাবখানা।
পুকুর পাড়ে পাঁচিল ধারে
মস্ত একটা চীনা বট
দাঁড়িয়ে আছে চুপ্‌টি করে
নামিয়ে হাজার ঝুরির জট।
আদ্যিকালের বদ্যিবুড়োর
ডালপালা আর ঝুরির ভার
জমিয়ে রাখে চারপাশে তার
কোন্‌ সে কালের অন্ধকার।
গা ছমছম্‌ অবাকরকম
অসম্ভবের রাজ্যটায়
কত কি যে হয় সেখানে
ছোট্ট রবির কল্পনায়।

১০

ইস্কুলেতে যাবার বয়স
হয়নি তখন রবির যে।
বাড়িতেই গুরুমশাইর
কাছে বসে সে শিখছে
অ আ ক খ কর খল
বানান টানান ইত্যাদি।
সঙ্গীরা তার ইস্কুলে যায়
ঘোড়ার গাড়ি রোজ চাপি।
গাড়িতে তার হয়নি চড়া,
যায় নি বাঁড়ির বাহিরে,
ওদের কাছে গল্প শোনে
অবাক্ চক্ষে চাহি রে।
ঘরে রবির মন টেঁকে না,
যাবেই সেও ইস্কুলে,
জুড়লো বেজায় কান্নাকাটি
প্রাণপণে সোরগোল তুলে।
কিছুতে তার গোল থামে না,
গুরুমশাই ঠাস্ করে
এক থাপ্পড় কষিয়ে গালে
বলেন, শুনে রাখ ওরে—

ইস্কুলে আজ যাবার ঝোঁকে
কাঁদছো যত কান্নাই,
ঢের বেশি তার কাঁদবে পরে
না যাবারই জন্যই।
এমন খাঁটি সত্যি কথা,
এমন ভবিষ্যৎ বাণী
জীবনে সে আর শোনে নি,
নিজেই অবাক যায় মানি।
স্কুল-পালানো ছেলে বলে
নাম রটে যায় তার অতি,
ইতিহাসে রয়ে গেল
চিরদিনের সেই খ্যাতি।

১১

তখনো ওঠেননি কো পুবে রবিমামা।
উঠে পড়ে ছোট রবি, গায়ে নেই জামা।
কুস্তির সাজ পরে চলে গোলাবাড়ি,
কানা এক পালোয়ান আছে বুড়োধাড়ি,
তার কাছে শেখা চলে কুস্তির প্যাঁচ,
সারা গায়ে মাটি মেখে ধ্‌পুস ধ্‌পাস্‌।
ফিরে এসে দ্যাখে, এক হবু ডাক্তার
বসে আছে চেনাতে সে মানুষের হাড়।
দেয়ালে ঝুলছে এক গোটা কঙ্কাল,
বাতাসেতে খটাখট্‌ দোলে তালে তাল।
দেউড়িতে ঢং ঢং যেই বাজে সাত,
মাস্টার নীলকমলের পদপাত
ঘড়িধরা সময়ের কাঁটায় কাঁটায়,
হায়রে একটা দিনও বাদ নাহি যায়!
শ্লেট নিয়ে ঘাড় গুঁজে কষে চলে আঁক,
শ্লেটের আড়াল দিয়ে একটু যে ফাঁক—
সেই ফাঁকে উঁকি মেরে নিচে দেখা যায়,
দারোয়ান দাড়ি বাঁধে, কাক ছোলা খায়।

মাস্টার উঠতেই সোজা ছুট্ মারে,
পুঁতেছে আতার বিচি বারান্দা ধারে।
চারা তার গজায় না—যত ঢালে জল,
ঘড়িতে বাজলো ন'টা, ইস্কুলে চল্।
বেঁটে কালো গোবিন্দ স্নানে যায় নিয়ে
ময়লা হল্‌দে এক গামছা ঝুলিয়ে।
রোজকার থোড়বড়ি ভাত ডাল ঝোল
খেতে রুচি হয়নাকো, তাই নিয়ে গোল।

এদিকে দশটা বাজে, বুড়ো ঘোড়া গাড়ি
ইস্কুলে টেনে নিয়ে চলে তাড়াতাড়ি।
ইস্কুল নয় সে তো যেন জেলখানা,
দশটা চারটে চলে বাঁধা একটানা
ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঠাসাঠাসি পড়া।
দূর নীল আকাশেতে চিল হয়ে ওড়া
তার চেয়ে ঢের ভালো। বাজে সাড়ে চার,
এসে গেছে জিম্‌নাস্‌টিকের টিচার।
বাড়ি ফিরে কিছুখন তাই চটপট
কাঠের ডাণ্ডা ধরে ওলোট্ পালট।
তিনি যেতে না যেতেই ছবি আঁকবার
মাস্টার এসে যান, দম ছাড়বার
একফোঁটা ফাঁক নেই, শেষ হলো দিন,
পড়বার ঘরে জ্বলে তেলের পিদিম।
অঘোরবাবুর কাছে ইংরেজি পড়া,
বইখানা ঢল্‌ঢলে, পাতাগুলো ছেঁড়া।
ওৎ পেতে আছে সেটা টেবিলের পরে,
পড়তে বসেই চোখ ঘুমে আসে ভরে।
ঢুলতে ঢুলতে পড়া, উপায় কি আর,
যত পড়া, না পড়াটা ঢের বেশি তার।

বৃথা চোখে জল দেওয়া, বৃথা পায়চারি,
কোনো ওষুধেই কাজ দেয় নাকো তারি।
অবশেষে পড়া থেকে ছুটি মেলে যেই,
চোখে তার ঘুম আর একফোঁটা নেই।
বিছানায় শুয়ে শুয়ে রূপকথা শোনা—
তেপান্তরের দেশে চলে আনাগোনা।

১২

দিব্বি মজা ছুটির দিনে,
ঠিক দুক্কুর বেলা
সবাই যখন নিদ্রা মগন,
জমলো রবির খেলা।
ঠাকুরমাদের আমলের ওই
জবর পালকিখানা—
আট দু'গুণে ষোল বেহারায়
হতো যেটা টানা,
পড়ে আছে অবহেলায়
বারান্দার একধারে।
রঙ চটেছে, কাঠ ফেটেছে,
কেউ দ্যাখে না তারে।
চুপি চুপি তার ভেতরে
পড়তো ঢুকে রবি,
পাল্লাগুলো বন্ধ করে
অন্ধকারের ছবি
দেখতো বসে চুপটি করে,
ভাবতো মনে—ঠিক
সাগর মাঝে সে যেন এক
নাম-না-জানা দ্বীপ।

চারপাশে ঢেউ উঠছে ফুলে,
    সাগর ওঠে ফুঁসে,
ছুটির দিনে রবি এখন
    রবিনসন ক্রুসো।
অচল পাল্কি মনের মধ্যে
    সচল হয়ে ওঠে,
কখন পক্ষীরাজ বা কখন
    ময়ূরপঙ্ক্ষী ছোটে।
পার হয়ে যায় দেশ-দেশান্তর,
    দেয় সমুদ্দুর পাড়ি,
ভূগোলে পড়া নামগুলো সব
    পার হয় তাড়াতাড়ি।

এক একদিন তো রবি আবার
    বেত হাতে মাস্টার,
বারান্দার সব রেলিংগুলো
    দুষ্টু ছাত্র তার।
পড়াশুনায় মন নেইকো,
    কেবলই বাঁদরামি,
মার খেয়ে গায় দাগ পড়ে যায়,
    কমে না দুষ্টামি।
রবি শাসায়, আমার কথা
    শুনছো না এই বেলা।
বড় হয়ে কুলিগিরির
    বুঝবে কেমন ঠ্যালা!

১৩

রবির বয়স সাত আট বছর,
ভাগ্‌নে তার এক জ্যোতিঃপ্রকাশ—
মামার চেয়ে ভাগ্‌নে বড়ো,
এক দুপুরে করলো সে ফাঁস
পদ্য লেখার রহস্যটা—
চৌদ্দ আখর গুণে গুণে
পয়ার ছন্দে পদ্য গাঁথার
সহজ হিসেব এই শিখে নে।

পদ্য আবার যায় কি লেখা ?
কাণ্ড দেখে অবাক রবি।
ছন্দে তালে মিলের মায়ায়
মনে যে হয় স্বপ্ন সবই।
বাস্‌, রবিকে কে ধরে আর,
নীল কাগজের জুটিয়ে খাতা
পদ্য বোঝাই করছে তাতে
দিন রাত্তির পাতা পাতা।

সদ্য নতুন শিং-গজানো
যেমন দশা হরিণছানার,
যাকেই দ্যাখে তাকেই গুঁতোয়—
রবির ও ঠিক তেমনি আচার
উৎপাতে তার সবাই কাতর,
যখন যাকে যেখানে পায়—
পকেট বোঝাই পদ্যমালা
ধরে বেঁধে তাকেই শোনায়।
কুড়িয়ে হঠাৎ পেয়েছে সে
কাব্যলোকের চাবিকাঠি।
বিশ্বভুবন ছন্দ—দোলায়
বাজায় তাহার প্রাণবীণাটি।

১৪

রবি নাকি লেখে বেশ পদ্য,
ইস্‌কুলে রটে যায় সদ্য।
শিক্ষক সাতকড়ি দত্ত
রবিকে বিশেষ স্নেহ করতো
মাঝে মাঝে লিখে দুই ছত্র
বলতেন, লিখে আনো অত্র
মিল রেখে দুই চারি পংক্তি।
রবিও যায় না মোটে কর্মতি-
পরদিন ঠিক লিখে আনতো
ভাব মিল রেখে অভ্রান্ত।
মোটাসোটা বেঁটে ঘনকৃষ্ণ,
কালো চাপকানে সমাকীর্ণ
গোবিন্দবাবু, হাতে বেত্র,
গম্ভীর ঠোঁট মুখ নেত্র,
ইস্‌কুল সুপারিনটেন্‌ডেন্ট—
ভয়ে সব ছাত্রের মাথা হেঁট

একদিন স্কুলে তাঁর কক্ষে
ডাক পড়ে, দুরু দুরু বক্ষে
রবি গিয়ে দাঁড়াতেই সন্ত্রাস—
গোবিন্দবাবু দেন ফর্মাশ
নীতিকথা ভরা ভাব ভঙ্গির
লিখতে পদ্য গুরু গম্ভীর।
জো হুকুম, রবি মহানন্দে
নীতিকথা লিখে আনে ছন্দে।
গোবিন্দবাবু দেখে তুষ্ট,
মেজাজটা তাঁর বেশ খুশ্‌তো,
রবিকে সঙ্গে নিয়ে চল্লেন,
ক্লাসের মধ্যে ঢুকে বল্লেন—
পদ্যটা পড়ো জোর জোরসে।
গলা ছেড়ে পড়ে রবি তোড় সে।
ছেলেরা পেছনে কাটে চুক্‌লি,
কেউ বলে, পুরোটাই টুক্‌লি।
দেখিয়ে সে দিতে পারে নির্ঘাৎ,
কোত্থেকে টুকে এই বাজিমাৎ।
কিন্তু কে আর করে অত খোঁজ !
তারপর থেকে ক্লাসে রোজ রোজ
বেড়ে চলে কবিদের সংখ্যা
নীতিকে দেখিয়ে লবডঙ্কা !

১৫

কালিতে তো সবাই লেখে,
রবির হঠাৎ সাধ হলো,
ফুলের রঙিন রস দিয়ে সে
লিখবে কাব্য জমকালো।
ফুলদানিতে সাজিয়ে দিত
মালিরা রোজ ফুল তুলে,
টিপে টিপে সে ফুলগুলো
নিংড়ানো সব রস গুলে
কলম-ডগায় তাও ওঠে না,
এ তো দারুণ ঝক্‌মারি!
কুছ পরোয়া নেইকো, আছেন
নতুন দা তার কাণ্ডারী।
রবি গিয়ে বায়না ধরে—
ফুলের রঙিন রস থেকে
কালি করার কল বানাবো,
মিস্তিরিকে দাও ডেকে।
আবদারে তার ছুতোর এলো,
আর এলো সব কাঠ-কোটা,
চললো আজব কল বানানো,
নয়কো সোজা কাণ্ডটা।

ছেঁদাওলা কাঠের বাটির
সঙ্গে দড়ির গিঁট দিয়ে
হামানদিস্তের একটা নোড়া
বাঁধা হলো আটকিয়ে ।
তার সাথে এক ঘুরিয়ে চাকা
ঘুরবে নোড়া ফুরতিতে,
ফুলে ভরা কাঠের বাটি
রস ঝরাবে ভরতি রে ।
কল তো হলো, হায়রে একি !
চাকা যতই ঘুরছে—না,
ফুল পিষে সব থেঁতলে কাদা,
একটুও রস ঝরছে না ।
ফুলের রঙে কাব্য রঙিন
লেখা হলো আর সে কই ?
চিরদিনের কুচকুচে সেই
কালো কালি, তাহাই সই !

১৬

সা রে গা মা পা ধা নি
যেন সোনায় বাঁধানি
রবির গানের গলাটা।
কী মিষ্টি—তা বলার না!
এক অনুচর বাবার যে,
নাম কিশোরী চাটুজ্জে,
টাক ঝকঝক্ মাথাটা,
মুখে হাসি তার বাঁধা,
গলায় ছড়া ছড়ানো
সুরের ঝর্ণা ঝরানো।
দাশুরায়ের পাঁচালি
মুখস্থ তার সকলই।
আফশোস্ তার রইলো যে—
মন্দ কপাল, তা নইলে
দাদাভাই তার কেন রে
নিয়েও গলা হেন রে
পাঁচালি দলে কোন্ একটা
ভর্তি হয়ে গেল না!
হলে তবু যা হোক তো
দেশে একটা নাম হতো!

এক যে বাবু শ্রীকণ্ঠ
ফূর্তি প্রাণে প্রচণ্ড,
গোঁফ দাড়ি সব কামানো,
মস্ত টাকে বাঁধানো
চক্‌চকে তাঁর মাথাটা,
হাস্য-উজ্জল চোখ দুটা,
ফোকলা মুখে কোথাও
দাঁত নেই তাঁর একটাও।
স্বভাবটি তাঁর ঠিক যেন
পাকা বোম্বাই আম হেন।
একটুও টক, একটু আঁশ
নেইকো, ভারি মিষ্টি শাঁস।
আবাল বৃদ্ধ সবারই
যেন সমান বয়সী।
সঙ্গী তাঁর এক গুড়গুড়ি,
তামাক টানেন অম্বুরি,
ছড়ায় মিষ্টি সুগন্ধ—
যেন প্রাণের আনন্দ।
কোলে কোলে সর্বদা
ফিরছে সাধের সেতারটা।
কণ্ঠভরা অফুরান
গান চলেছে অবিশ্রাম।
গান তো তিনি শেখান না,
কায়দা কানুন দেখান না,
গান তুলে দেন প্রাণেতে,
যে নেয়, শুধু জানে সে।
রবি প্রিয় শিষ্য তাঁর,
সবাইকে গান শোনাবার
জন্য তিনি রবিকে
নিয়ে ঘোরেন চারিদিকে।

সঙ্গে নিজেও ধরেন তান,
সেতারেতে মারেন টান,
মাথা নাড়েন মুগ্ধতায়,
গান থামানো তখন দায়!

কত ওস্তাদ যায় আসে,
সুরের মায়া চারপাশে।
গান শেখা আর না-শেখায়
দিব্বি রবি দিন কাটায়।

সুরের গুরু নতুন দা,
গান গাওয়া আর গান বাঁধা
আপন মনে তাঁর কাছে।
গানের পরে গান আসে।
রবির গলায় গান শুনে
বাবা বলেন প্রাণ খুলে—
দেশের রাজা আজ যারা,
বুঝতো যদি দাম তারা,
করতো কবির সমাদর।
যখন তা দূর-দূরান্তর,
কাজটা তখন আমাকেই
করতে হলো—এই বলেই
দিলেন কবির মর্যাদার
পাঁচশো টাকা পুরস্কার!



১৭

বাজলো সানাই, সাজলো বাড়ি,
লাগলো জ্যোতিদার বিয়ে।
বাড়ির নতুন বউ এলো ওই
চতুর্দোলায় দোল দিয়ে।
শ্যামলাবরণ কচি হাতে
সোনার চুড়ি, গলায় হার।
কোন মায়াবী দেশের মানুষ—
পায় না রবি নাগাল তার।
দূরে দূরে ঘুরে বেড়ায়,
হয় না সাহস পাশ যেতে।
সবার স্নেহের পাত্রী ও যে,
হেলাফেলার মানুষ সে।
দিনে দিনে ঘুচলো বেড়া,
মুছলো গণ্ডি অচেনার,
দিব্বি কেমন ভাব হয়ে যায়
ছেলেমানুষ দুই জনার।
নতুন বৌঠান রাঁধেন ভালো,
ভালোবাসেন খাওয়াতে।
রবিই প্রধান ব্যক্তি তাঁহার
নেমন্তন্ন পাওয়াতে।

বিয়ের আসর বসতো যখন
সাধের খেলার পুতুলটির,
ভোজের পাতের পাশে তখন
ঠিক সময়ে সে হাজির।
স্কুলের থেকে ফিরে এলে
তৈরি থাকতো তাঁর প্রসাদ—
চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি আর
লঙ্কামাখা পান্তা ভাত।
কখন যদি যেতেন কোথাও
আত্মীয়দের কোন বাড়ি,
অভিমানে রবির তখন
তাঁর সঙ্গে জোর আড়ি।
ঘরের সামনে চটিজোড়া
যেই দেখে—নেই,অম্‌নি রাগ।
একটা কোনো দামি জিনিস
লুকিয়ে রেখে ঝগড়া লাগ্‌।
বলতো রবি, তুমি গেলে
সাম্‌লাবে কে ঘর তোমার?
আমায় কেন ধরছো শুনি?
আমি তোমার চৌকিদার?
বলতো বৌঠান রাগ দেখিয়ে,
কাজ নেই আর সামলে ঘর।
সামলে রেখো দেখি নিজের
হাত দু'খানা অতঃপর।

পাখি পোষার শখ বৌঠানের,
বারান্দাটায় পশ্চিমের
ঝুলতো খাঁচা সারি সারি
হরেকরকম পক্ষীদের।

চীন দেশের এক শ্যামাপাখি—
বৌঠান তাকে পোষ মানান।
কাপড়-ঢাকা খাঁচা থেকে
শিস্ দিয়ে সে করতো গান।
রবির ভারি কষ্ট দেখে
বন্দীদশা পাখিদের।
কিন্তু কে কার কথা শোনে—
প্রলাপ ছেলেমানুষের!
একবার তাঁর হলো হঠাৎ
কাঠবিড়ালি পোষার শখ,
খাঁচায় দুটো কাঠবিড়ালি
লাফ-ঝাঁপে হায় অপারগ।
কাজটা খুবই হচ্ছে খারাপ,
রবি জানায় আপত্তি
বৌঠান বলেন, ঢের হয়েছে,
গুরুগিরি থাক্ দেখি।
রবি তখন কি আর করে,
একফাঁকে সে লুকিয়ে
খাঁচা খুলে দিল তাদের
বন্দীদশা চুকিয়ে।
এমনি তাদের ঝগড়া চলে,
চলে নানান্ খুনসুটি,
কথায় কথায় তর্ক বাধে
ক্ষুদে দেওর বৌদিটির।
তর্কে রবি সদাই হারে,
একমাত্র কারণ তার—
বৌঠান কোনো দেন না জবাব,
ভঙ্গিটা তাঁর উপেক্ষার।

আর সে হারে দাবাখেলায়,
সে খেলায় তাঁর হাত পাকা।
কিছুতে আর মানটা নিজের
যায় না মোটেই ঠিক রাখা।

কোনো কিছুই রবির যেন
বৌঠানের নয় পছন্দ,
সবতাতেই খুঁত ধরেন তার—
হায়রে কপাল কী মন্দ!
চেহারাটা খারাপ যদি,
সে দোষটা তো বিধাতার।
গানের গলার প্রশংসাটা—
তাও আসে না মুখে তাঁর।
আরো ভালো অমুক লোকের
গলা—তিনি শুনেছেন।
এ সব বলে প্রায়ই বৌঠান
রবিকে জোর রাগিয়ে দেন।
রবির লেখার হাত আছে বেশ,
সবাই মানে সে কথা।
বৌঠান বলেন, যাই লেখো না—
তুমি কোনোদিন হবেও না
বিহারীলালের মতো কবি।
শুনে রবির মন খারাপ।
বর্তে যেতো, মিলতো যদি
তার চেয়ে এক নিচের ধাপ।
শুধু রবির একটা গুণের
উচ্চ খ্যাতি তাঁর কাছে—
সরু সরু সুপরি কাটায়
দিব্বি রবির হাত আছে।

বৌঠানই তার ছেলেবেলার
আনন্দ আর বেদনা,
ঠাট্টা আদর অভিমানে
অলক্ষ্যময়ী প্রেরণা।
হঠাৎ তিনি অকালে, হায়—
হলেন আত্মঘাতিনী।
কবির মনে ধ্রুবতারা
হয়ে জাগেন সেই তিনি।



১৮

রবি এবার বিলেত যাবে,
সঙ্গে যাবে কে?
মেজোদাদা সত্যেন্দ্রনাথ
কোমর বেঁধেছে।
স্কুলের গণ্ডি কিছুতে আর
হলো না সে পার,
বিলেত গিয়ে রবি এবার
হবে ব্যারিস্টার।
তার আগে চাই ইংরেজিটা
ঠিকসে শিখে নেওয়া,
চলন বলন সবকিছুতেই
জোরসে পালিশ দেওয়া।
আমেদাবাদ বোম্বাইতে
বেশ কিছুদিন থেকে
জাহাজ চড়ে রবি শেষে
বিলেত গিয়ে ঠেকে।
সেথায় মেজ বৌদি আছেন,
তাঁর দু' ছেলেমেয়ে।
দিন কাটে বেশ কাব্য লিখে
গান শুনে গান গেয়ে।

কপালে নেই লেখাপড়া
নেই ব্যারিস্টার হওয়া,
মিথ্যে ক'দিন কষ্ট করে
কলেজ আসা-যাওয়া।
নতুন এ দেশ, নতুন মানুষ,
নতুন জলুস ভরা—
রবির চোখে ধাঁধা লাগায়
চিত্ত অবাক্-করা।
বাবা লেখেন, ঢের হয়েছে—
কাজ নেই আর পড়ে,
ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো
ঘরের ছেলে ঘরে।

১৯

সদর স্ট্রীটের
এক বাড়িতে
জ্যোতিদাদা
থাক্‌তো তখন,
রবিও তাঁর
সঙ্গে বাঁধা।
বারান্দাতে
দাঁড়িয়ে রবি
এক সকালে,
গাছপালাদের
পত্ররাশির
অন্তরালে
উঠছে সূর্য,
আলোর ছটায়
আকাশ ভরে।
উদ্ভাসিত
আলোর বানে
কেমন করে
রবির হৃদয়
হঠাৎ যেন
উঠলো দুলি,
চোখের উপর
পর্দা কিসের
গেল খুলি।



ঘুম ভেঙে তার
ঝর্ণা যেমন
পাগল-পারা
মহাসাগর
পানে ছোটে
আত্মহারা—
রবির পরাণ
উঠলো জেগে
তেমনি করে.
জগৎ আসি
কোলাকুলি
করছে ওরে।
বিশ্বব্যাপী
উৎসবেরই
আহ্বানে
কবির হৃদয়
যায় ভেসে সেই
আলোর বানে।
এত আবেগ
এত কথা
এত যে গান
কোথায় ছিল
কোন্ গোপনে
প্রকাশম্লান!
উৎস-মুখে
উৎসারিত
কাব্যধারা
চললো বয়ে
সারা জীবন
বাঁধনহারা।



২০

আদি কবি বাল্মীকি
রামায়ণ-গান লিখি
    সংসার করেছেন ধন্য!
জোড়াসাঁকো প্রাঙ্গনে
দেখে দর্শক জনে
    নবীন সে বাল্মীকি অন্য।
রবির এ অভিনয়
যেন অভিনয় নয়,
    অপূর্ব সেই ভাবমূর্তি।
চাহে না সে ধনমান,
প্রাণে তার বাজে গান,
    চোখে মুখে কি আকুল আর্তি!
ধরা দেন বীণাপাণি,
আপনার বীণাখানি
    উপহার দেন নিজ ভক্তে।
যে গান গাহিতে সাধ,
দেবীর আশীর্বাদ—
    ধ্বনিত হবে সে বীণা-তন্ত্রে।

সেই গীতি-নাটিকার
বাল্মীকি-প্রতিভার
অভিনয় হলো বুঝি সত্যি,
পেলো সে দেবীর বীণা—
আপনার মনোলীনা,
মিথ্যে তা নয় একরত্তি।
বাজে তা কত না সুরে
উদার জগৎ জুড়ে,
মানব-হৃদয় করে পূর্ণ।
বিশ্বের সভাকবি,
নব প্রভাতের রবি—
নব বাল্মীকি অবতীর্ণ।

২১

রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন
খ্যাতনামা লেখক যে।
অনেক লোকে এসেছে তাঁর
মেয়ের বিয়ের আসরে—
অনেক জ্ঞানী, অনেক গুণী,
ধনী ও মানী অনেকে,
তাঁদের মধ্যে মহামান্য
অতিথি এক এসেছেন—
লেখককুলের শিরোমণি
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, তাই
সমাদরে পরান মালা
তাঁর গলাতে সকলেই।
নবীন কবি রবির ছিল
সেই আসরে আমন্ত্রণ,
পাশাপাশি মিললো আসি
নূতন এবং পুরাতন।
বঙ্কিম তাঁর গলার মালা
খুলে ফেলে তৎক্ষণাৎ
পরান নিজে রবির গলায়,
মাথাতে তার রাখেন হাত।
বলেন, বাণীর বরণমালা
এর গলাতেই শোভা পায়
নূতন কালের সুর বাজে কী
মধুর রাগে এর বীণায়!
সেই অপরূপ দৃশ্য দেখে
সবাই অপলক চোখে—
অস্তগামী চন্দ্র বরণ
করছে প্রভাত-সূর্যকে!



২২

ঢ্যাম্ কুড়কুড় বাদ্যি বাজে,
রবির এবার বে।
অনেক খুঁজে খুলনা থেকে
কন্যে এনেছে।
কেমন কন্যে রবির জন্যে?
ফুলতলির সে ফুলি!
গ্রামের খেলাঘর থেকে তার
আনলো তাকে তুলি।
কন্যে তো সে কচি খুকি,
নাম ভবতারিণী,
আদ্যিকেলে নাম বদলে
হলো মৃণালিনী।
বর যাবে না বিয়ে করতে,
খামখেয়ালি সে,
ঘরে বসেই করবে বিয়ে—
বায়না ধরেছে।
বর গেল না টোপর মাথায়,
কি করবি কর।
কন্যে এলো বিয়ে করতে
উলটে বরের ঘর!
উলু-উলু—বর পিঁড়িতে,
সে কি বরের সাজ,
বেনারসী শাল গায়ে কোন
বাদশা মহারাজ!
কেউ দেখেনি এমন বিয়ে,
এমন সে এক বর।
ভাগ্যিমানী বউ সে, এলো
এমন বরের ঘর!

২৩

এপার পদ্মা ওপার পদ্মা
তীরের পাশে চর,
সেই চরে বোট বেঁধে রবি
পাতলো নতুন ঘর।
পদ্মাতীরে শিলাইদহে
মস্ত জমিদারি।
তীরের কাছে ঐ দেখা যায়
এক সে কুঠিবাড়ি।
কোন সে কালের নীলকরদের
প্রাচীন কুঠিঘর,
ঠাকুরবাড়ির কাছারিতে
তখন রূপান্তর।
জোড়াসাঁকো ছেড়ে এবার
চললো সেথা রবি।
বাবার হুকুম, এখন থেকে
দেখতে হবে সবই।
করলো না সে লেখাপড়া,
শিখলো না তো কিছু,
দেখুক এবার জমিদারি,
আর নয় সে শিশু।
কেবল নাটক গান-বাজনা,
কাব্য লেখালেখি।
কল্পলোকের থেকে এবার
মর্তে নামুক দেখি।
চললো রবি শিলাইদহে,
এ তো শাপে বর!
স্বর্গ এসে ধরা দিল
মর্তলোকের পর।

কুঠিবাড়ির কাছারিতে
জমিদারির ফাঁস,
নদীর বুকে বোটে কবির
আপনমনে বাস।
জল্ ছল্‌ছল্ ঢেউ কল্‌কল
পদ্মা বয়ে যায়,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে
মাটির আঙিনায়।
অসীম আকাশ, উদার বাতাস,
শ্যামল কোমল ধরা
নিত্য নতুন রূপের মায়ায়
সাজছে মনোহরা।
সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে,
রাতের তারা ফোটে,
রঙের খেলায় ঋতুর মেলায়
ভুবন ভরে ওঠে।
তারই মাঝে আপন বেগে
পদ্মা বয়ে চলে,
দুই তীরে তার জীবনধারা
মুখর কোলাহলে।
কত আশা, ভালোবাসা,
কত কান্নাহাসি,
চিরকালের রঙে রাঙা
দুঃখ-সুখের রাশি।
প্রকৃতি আর মানুষ মিলে
হলো যেথায় এক,
সেইখানে সেই বিশ্বসভায়
কবির অভিষেক।



২৪

নামটি মাধুরীলতা—
মনে মনে থাক্ সে,
বেলা বেলি বেলুরাণী—
আদরের ডাক যে।
ফুট্‌ফুটে গোলগাল,
টুকটুকে ফুলটি—
বাবার সে বড়ো মেয়ে,
মোমের পুতুলটি।
আগড়ুম বাগড়ুম্
কত কি সে বকছে,
যতখন জেগে থাকে,
তাকে কে থামাচ্ছে!
তারপরে এক ভাই—
বিলকুল শান্ত।
কেউ বলে, বড় হলে
হবে সে একান্ত
হয় মুনি, নয় ঋষি,
না হয়তো গোমড়া;
সে কথায় বিশ্বাস
কোরো নাকো তোমরা!
বাবার নামের মিলে
রথীন্দ্র নাম তার,
বাবা ডাকে রথী বলে,
ছেলে ভারি বুঝদার।

পরের বোনটি রাণী,
ভালো নাম রেণুকা।
মা বলে, সামাল দিতে
জ্বলে পুড়ে গেনু গা!
অতি জেদী, একরোখা,
ভারি অভিমানিনী,
চড়া সুরে তার বাঁধা
সপ্তম রাগিণী!
খেয়াল খুশিতে ভরা,
উদাসিনী দৃষ্টি,
নেই সাজ নেই গোজ,
এ কি অনাসৃষ্টি!
অবুঝ, ছন্নছাড়া!
ঠিক তার উলটা
তার ছোটবোন মীরা,
শোধরায় ভুলটা।
ছোট্ট মিষ্টি মেয়ে,
অতিশয় লক্ষ্মী,
সাড়া তার পায় নাকো
বুঝি কাকপক্ষী!
শান্ত সরল ভারি,
একেবারে ঘরোয়া,
রাণীদির মতো নয়
দারুণ বেপরোয়া।

সব্বার ছোটো শমী—
আদরের ভাইটি,
ঠিক যেন ছোটো রবি,
একটুও ভুল নাই।

বুঝি কোন্ দেবশিশু
লাবণ্যে উচ্ছল,
নাচে গানে অভিনয়ে
সদা প্রাণচঞ্চল।
মনে ভারি সাধ তার—
বড় হলে হবে সে
বাবার মতন ঠিক,
সববাই দেখবে।
হলো না তো বড়ো হওয়া,
কুঁড়িতে সে ঝরলো।
বেদনার পাত্রটি
অশ্রুতে ভরলো।
অসময়ে মৃণালিনী
চলে যান স্বর্গে,
রাণী, শমী, বেলা যায়
তাঁর পর পর যে
একে একে মা'র কাছে,
কেটে যায় ছন্দ।
দুঃখের রাতে কবি
জাগেন অতন্দ্র।

২৫

চারদিকে ঐ করছে ধু ধু
ঢেউ খেলানো মাঠটি শুধু ।
খোয়াই ভরা রুক্ষ রাঙা
মাঠের নাম ভুবনডাঙা ।
উড়ছে হাওয়ায় ধুলো লাল,
একটা দুটো খেজুর তাল ।
নেই কোনো গ্রাম, নেইকো ঘর,
সে যেন এক তেপান্তর ।
বুক চিরে তার লম্বা টানা
রাঙা মাটির রাস্তাখানা
কাঁকর ভরা, ছায়াহারা
চলে গেছে উদাসপারা
বোলপুরের ইষ্টিশানে
তপ্ত রোদের মধ্যিখানে ।
এদিক ওদিক সেদিকে চাই,
একটু ছায়া কোথাও নাই ।
দুটো ছাতিম একটি পাশে
শীতল ছায়া ছড়িয়ে আছে ।
তার তলাতে দেবেন্দ্রনাথ
জুড়ান ক্লান্তি অবসাদ ।
পেলেন যেন নিজের মনে
শান্ত নীরব সে নির্জনে
মনের শান্তি, প্রাণারাম ।
সেইখানে তাই পুণ্যধাম
গড়েন শান্তিনিকেতন ।
সে যেন এক তপোবন
উঠলো হয়ে দিনে দিনে
বিশ্বলোকের হৃদয় জিনে ।

আমের কুঞ্জ, শালের বীথি,
পাখির কণ্ঠে কলগীতি,
তরুলতার শ্যামল মেলা,
আকাশ ভরা আলোর খেলা,
পাতায় পাতায় হাওয়ার নাচন
করে সবার হৃদয় হরণ।

সেই প্রকৃতির কোলের মাঝে
কবিগুরুর স্বপ্ন রাজে—
বিশ্ববিদ্যা তীর্থধাম,
বিশ্বভারতী তারই নাম।
এই মানবের সাগরতীর,
বিশ্ব যেথায় বাঁধবে নীড়।
কে জানে সেই স্বপ্ন কবে
ভবিষ্যতে সফল হবে!
সন্ধ্যা সকাল আজো শুনি
বৈতালিকের মধুর ধ্বনি।
ছাতিমতলায় শিশির ঝরে,
বকুল গন্ধ আকুল করে,
শাল পিয়ালের শ্যামল ছায়া
ছড়িয়ে রাখে মধুর মায়া।
উপাসনার ঘণ্টা বাজে
মন্দিরে, না মনের মাঝে!
দেশ বিদেশের মানুষ জোটে,
পৌষমেলা জমে ওঠে।
নাচ গান আর রঙের খেলা
মাতায় বসন্তেরই মেলা।
স্বপ্নে গড়া কবির ভুবন
বারেবারেই নিত্য নূতন।



২৬

ইস্কুল মানে ছিল ভয়ানক শাস্তি,
এবার সে ভয়ডর একেবারে নাস্তি।
আর নয় জেলখানা দশটা ও চারটার,
চার দেয়ালের বেড়া উঠলো যে এইবার।
লেখাপড়া শেখবার অপরাধে বন্দী
করে রাখবার আর চলবে না ফন্দি।
যে দুঃখে ছেলেবেলা ইস্কুল ভাগলেন,
সে বিধিনিষেধ কবি এইবার ভাঙলেন।
গড়লেন গুরুদেব যেন এক তপোবন,
হাসিখুশি-ভরা এই শান্তির নিকেতন।
খোলা আকাশের নিচে প্রাণমন মুক্ত,
অবারণ প্রকৃতির সাথে হয়ে যুক্ত
গাছতলে পড়ুয়ারা পড়াশুনা করছে।
মেঘ ভাসে, হাওয়া বয়, ফুল পাতা ঝরছে।
পাখিদের গানে মেশে ছাত্রের কণ্ঠ,
চোখে মুখে সকলের সরল আনন্দ।
কেউ নাচে, কেউ গায়, কেউ ছবি আঁকছে,
প্রকৃতির রূপ রস দেহে মনে মাখছে।
মাথার উপরে ঝরে রোদ ছায়া বৃষ্টি,
মনের মধ্যে এসে মেলে সারা সৃষ্টি।
খোলা চোখ, খোলা মন, যার প্রাণ চায় যা,
খোলা দশদিকে সব বিশ্বের দরজা।
আলো হাওয়া জল মাটি মানুষের অন্তর
একই সুরে মিলে যায় সেখানে নিরন্তর।
একি পাঠশালা, নাকি আশ্রম, ইস্কুল?
কবির ভুবনে এসে হয়ে যায় সব ভুল!



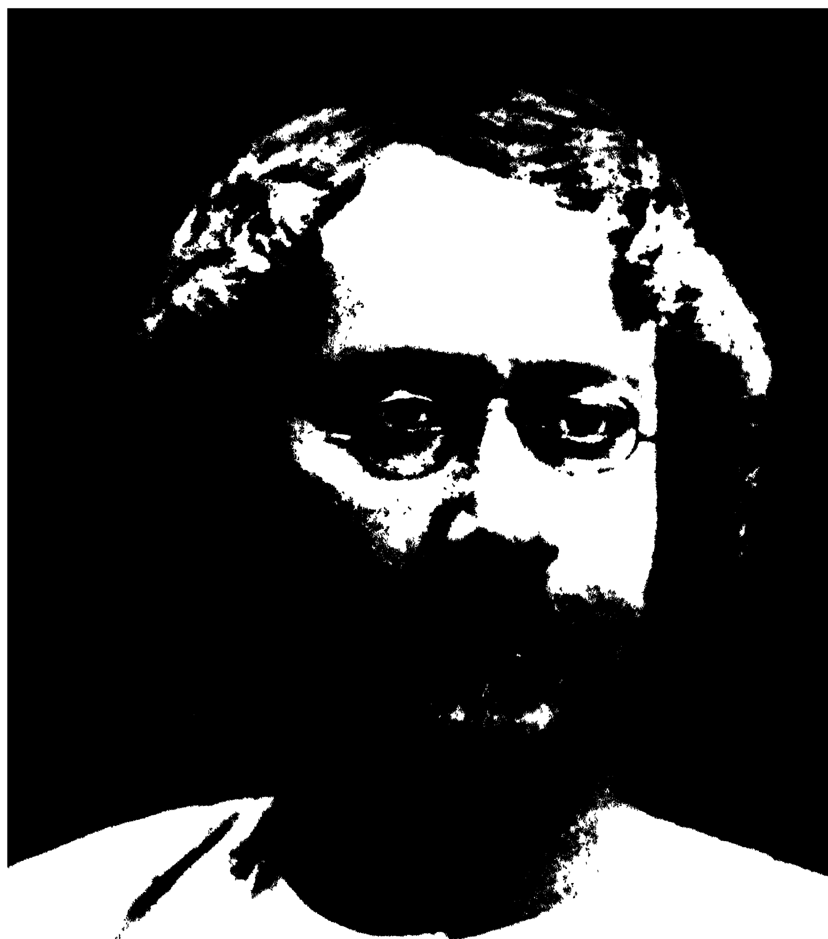
২৭

এই আমাদের দেশের মাটি
খাঁটি সোনার থেকেও খাঁটি,
মাটি তো নয়, এ আমাদের মা।
ছোট্ট থেকেই রবির প্রাণে
সে সুর বাজে গভীর তানে,
এমন দেশের কোথায় তুলনা!
হৃদয়হরা এই অপরূপ
ভুবন-মনোমোহিনী রূপ
কবির পরাণ পাগল করেছে,
পুণ্যময়ী জন্মভূমির
বন্দনাতে উতল অধীর
গানের মায়ায় আকাশ ভরেছে
বিদেশী সেই শাসক দলের
শাসন শোষণ অত্যাচারের
প্রতিবাদে কবি থামেন নি।
বাংলা যখন করলো দু'ভাগ,
কবির কণ্ঠে উদাত্ত ডাক—
আধখানা মা নয়কো কখনই।
মিলনমন্ত্রে বাঁধা রাখী
হাতে হাতে পরান ডাকি,
ভগবানকে জানান প্রার্থনা—
ঘরে ঘরে সব ভাই বোন
হোক এক প্রাণ, এক দেহমন!
সফল শেষে কবির কামনা।

ইতিহাসের কলঙ্ক দাগ
সেই জালিয়ানওয়ালা বাগ—
হাজার হাজার মানুষ যেখানে
ফাঁদে পড়া পশুর মতো
নির্বিচারে হলো হত
ইংরেজদের হিংস্র কামানে !
অমানুষিক এই মহাপাপ
দেখে সারা দেশ হতবাক্,
ঘুম ছুটে যায় কবির দু'চোখে ।
গর্জে ওঠেন কঠিনসুরে,
'স্যার' উপাধি ফেলেন ছুঁড়ে
সরকারী সে উচ্চ খেতাবকে ।
এই জননী দীন দুখিনী
আবার হবেন গরবিনী—
কাহিনী নয়, নয়কো কল্পনা ।
কবির গানে সে সুর বাজে,
বাজে সকল হৃদয় মাঝে,
এ দেশ কবির স্বপ্ন সাধনা ।

২৮

রবির আলোয় ক'রঙ থাকে বলো ?
সাতরঙা তার কিরণ ঝলোমলো।
মেঘের গায়ে সে রামধনু ফোটে,
আকাশখানা রঙিন হয়ে ওঠে।
মাটির রবি সেই রবিরই মিতা,
দুই রবিতে কি মিল—বলবো কি তা।
তার প্রতিভাও রামধনু রঙ মাখা,
বাণীর বনে মেলেছে সাত পাখা।
কাব্য নাটক গল্প উপন্যাসে
প্রবন্ধ আর ছবির রেখায় ভাসে
কত না রঙ এবং গানে গানে
ছাপিয়ে গেল হৃদয় রঙের বানে।
যখন যেমন যেদিক পানে চাই,
চোখ ফেরানোর উপায় তো আর নাই ;
ঠিক যেন সে মহান হিমালয়,
বিচিত্র সব চূড়ায় শোভাময় ;
হিমালয় তো একটি শুধু আছে
এই জগতে মোদের মাথার কাছে।
এই রবিকেও একটি শুধু পাই,
জগৎ-সভায় গর্ব করি তাই।



২৯

সারাজীবন লেখেন কবি
কতো যে সব কাব্য,
আমরা সারাজীবন ধরে
পড়বো শুনবো ভাববো।
কবে যে তাঁর লেখার শুরু—
সন্ধ্যা, প্রভাতসঙ্গীত,
ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল
নানান রঙে রঞ্জিত।
মানসী আর সোনার তরী,
চৈতালি ও চিত্রা,
কল্পনা, ক্ষণিকা, খেয়া,
গীতাঞ্জলির গীত-রা।
বলাকা আর পলাতকা,
পূরবী বা মহুয়া,
কতো যে নাম—কেউ বীথিকা,
শ্যামলী সে কেউ বা।
বারে বারে পালাবদল,
পালা কিন্তু একটা—
সীমার সঙ্গে সেই অসীমের
মিলন সাধন ঝোঁকটা।

জগৎ পারাবারের তীরে
শিশুরা সব খেলছে,
তাদের খেলা নানা রঙে
পাখনা রঙিন মেলছে
শিশু ও শিশু ভোলানাথে,
খাপছাড়ার সব ছড়ায়।
ক্লান্তিহারা কবির কলম
বয়সকে কি ডরায়?

শেষ জীবনের পর্বেও নেই
কবির লেখার কামাই—
আকাশপ্রদীপ, নবজাতক,
সেঁজুতি আর সানাই।
রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে
শেষ কবিতা লিখলেন,
সম্মুখ শান্তি পারাবারে
শেষ যাত্রায় ভাসলেন।

সোনার ধানে বোঝাই তরী
হেথায় জমা রইলো,
গানের ডালি গীতবিতান
চিরকালের হইলো।
সহজ সরল প্রাণের ভাষায়
ভরা গল্পগুচ্ছ,
বাংলা ছোটগল্পের শির
সসম্মানে উচ্চ।

মায়ার খেলা, শ্যামা—কতো
নৃত্য-গীতিনাট্য
চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা,
মজার তাসের দেশ-টা
নৃত্যে গীতে অভিনয়ে
মনোহরণ সৃষ্টি ।
উৎসবে আর অনুষ্ঠানে
সেইদিকে আজ দৃষ্টি ।
নাচ-গানের এই দল নিয়ে তো
কবিও কতো ঘুরলেন
দেশ বিদেশে প্রার্থী বেশে,
কতো টাকা তুললেন
গড়তে বিশ্বভারতী তাঁর,
আজ মনে হয় গল্প ।
নাটক লেখার সংখ্যাটাও
নিতান্ত নয় অল্প ।
রাজা ও রাণী, বিসর্জন আর
নটীর পূজা, ডাকঘর,
অচলায়তন, অরূপ রতন,
মুক্তধারা—তারপর
রক্তকরবী আর রাজা,
শারদোৎসব, ফাল্গুনী,
তপতী ও রথের রশি
কতো বা আর নাম গুনি !

উপন্যাসও কতোরকম—
আড়াল পড়েন বঙ্কিম ।
রাজর্ষি, বউঠাকুরাণীর
হাট—তারপর আর কিম ?

চোখের বালি, নৌকাডুবি,
গোরা ও ঘরে বাইরে,
শেষের কবিতার জুড়ি আর
একটাও তো নাই রে।
যোগাযোগ আর চতুরঙ্গ,
চার অধ্যায়, দুইবোন,
মালঞ্চ—সব এই আমাদের
জীবন মনের দর্পণ।

লিখতে গিয়ে কাটাকুটি,
মজার ব্যাপার বেশ তো—
ছবির পরে ফুটছে ছবি,
এ এক অচিন দেশ তো
কবির কাছে দিল ধরা,
নতুন খেলা জুটলো।
কথায় যাহা যায় না বলা,
রঙে রেখায় ফুটলো।
অবাক করা চিত্রকলা—
শেষ জীবনের সৃষ্টি
খুলে দিল বিশ্বজনের
নতুন শিল্পদৃষ্টি।

৩০

সেই যে ছোট্ট বীর পুরুষটি—
তার কথা আর কে না জানে !
মা-কে নিয়ে বিদেশ ঘুরে
যাচ্ছিল কোন দূরের পানে
রাঙা ঘোড়ায় টগবগিয়ে
মা-র পালকির পাশে পাশে ।
ঝাঁকড়াচুলো দস্যুগুলো
হা-রে-রে-রে করে আসে ।
একাই খোকা কল্পনাতে
সবগুলোকে ফেললো মেরে,
চিরকালের সেই খোকাটি
সকল খোকার মধ্যে যে রে !

কখন কি সাধ খোকার মনে,
ঠিকঠিকানা মেলাই দায় ।
কখন কানাই মাস্টার, কখন
বাবার মতন হতে সে চায় ।
চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে
ফুটতে যে চায় দুষ্টু খোকা ।
ইচ্ছেমতন ইচ্ছামতী
নদী হওয়ার সাধ কম না ।



খোকাখুকুর জন্যে কতো
দলে দলে রঙিন ছড়া —
ক্ষ্যান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির
সব কিছু সেই উল্টো করা।
বর আসে ঐ বাঁদের ছাদে,
গাড়ী মারে শালের মাথায়।
নাড়িটেপা ডাক্তারটার
দূর থেকে নাক ঐ দেখা যায়।
স্বপ্নে হঠাৎ কলকাতাটা
ছুটতে থাকে নতর্ক ভরে।
পুপেদিদির সঙ্গে কতো
আজব গল্প গড়গড়িয়ে।

দুষ্টু ফটিক বেড়ায় খেলে
মাঠে ঘাটে নদীর ধারে,
কলকাতা তার সব কেড়ে নেয়,
চির ছুটি জানায় তারে।
পাঁচ বছরের ছোট্ট মিনি
আর রহমৎ কাবুলিওলা
তাদের সরল সখ্য প্রাণে
চিরটা কাল রইবে তোলা।
হারিয়ে যাওয়া খোকাবাবু
রাইচরণের খোকা হয়ে
সত্যি বুঝি ফিরে আসে
অশ্রুসজল গল্প বয়ে।

রাজার চিঠির প্রতীক্ষাতে
বালক অমল বসে থাকে,
সঙ্গিনী তার ছোট্ট সুধা
কেমন করে ভুলবে তাকে !
সে সব কি কেউ ভুলতে পারে ?
কখনো তা যায় কি ভোলা ?
কাব্য নাটক গল্প গানে
আজও মনে লাগায় দোলা ।

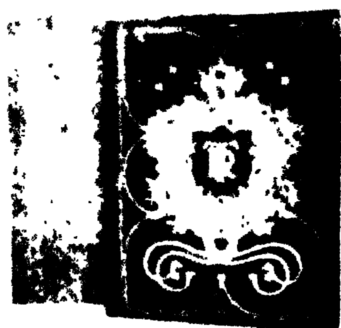
৩১

প্রতিদিন ভোরবেলা কে যে আগে উঠবে ?
ঘুম ভেঙে কার চোখ কার আগে ফুটবে ?
আকাশের রবি রোজ পাল্লাতে হেরে যায়,
পৃথিবীর রবি ওঠে তার ঢের আগে, হায় !
খুব ছোটবেলা শুধু মাত্তর একদিন
রাত্রে যাত্রা শুনে কখন সে ঘুমে লীন ।
মার ডাকে ঘুম ভেঙে রবি উঠে দ্যাখে কি—
অনেক হয়েছে বেলা, রোদে ঘর ভাসে, ছিঃ !
সেই একদিন শুধু, আর কক্‌খনো নয় ।
বিছানা ছাড়েন রবি, ভোর হয় কি না হয় ।
পুবের বারান্দায় পাতা ইজিচেয়ারে
থাকেন নীরবে বসে, ধ্যানে ডুবে যাওয়া সে
যেন কোনো মূর্তিটি । আঁধার সে টুটলো,
আলোকের শতদল ধীরে জেগে উঠলো ।
মুখোমুখি দুই রবি, যেন প্রীতি-বিনিময় :
এবার ওঠেন কবি, দিন তাঁর শুরু হয় ।
লেখার টেবিলে যান, চলে পালা সৃষ্টির—
কবির মানসলোকে কল্পনা-বৃষ্টির ।
নিম-সরবত রাখে বনমালী টেবিলে,
কড়া তেতো সে পানীয় কবি ছাড়া কে গিলে ?

সকালটা জুড়ে চলে রচনার পর্ব ।
চায়ের সঙ্গে কিছু চুষ্য ও চর্ব্য ।
দশটার পরে স্নান, বারোটার মধ্যে
খাওয়া-দাওয়া সারতেন নানাবিধ পদ দে ।
এটা ওটা টুকিটাকি কত কিছু রান্না,
ভোজনবিলাসী কবি, কম কিছু যান না
নতুন নতুন পদ করতে যে সৃষ্টি,
আর ভালোবাসতেন খেতে খুব মিষ্টি ।
খাবার মধ্যে তাঁর বেশি প্রিয় নিরামিষ,
খাওয়ার সঙ্গে জমে গল্পের মজলিস ।
দুপুরে পড়ার পালা, একটুও ঘুম নয়,
খবরকাগজ আসে, কত বই জমা হয় ।
আরাম চেয়ারে শুয়ে চলতো সে সব পড়া,
গায়ে ঢিলে পাঞ্জাবি, লুঙ্গি বা পাজামা পরা
কখনো চল্‌তো লেখা নানা চিঠি পত্তর,
ডাকে আসা চিঠিদের নিজ হাতে উত্তর ।
কত লোকে আসতেন সন্ধ্যার আসরে,
প্রায় সেই রোজকার সাহিত্য বাসরে
কবি পড়ে শোনাতেন নতুন রচনা তাঁর ।
স্মৃতিই সাক্ষী শুধু সেই সব সন্ধ্যার !

৩২

প্রাইজ ! প্রাইজ ! নোবেল প্রাইজ
সব প্রাইজের সেরা !
সে প্রাইজ পান বিশ্বজয়ী
প্রতিভাবানেরা ।
সাগর পারের দেশ থেকে তার
ডাক এলো একদিন —
'গীতাঞ্জলি'র কবি রবি
এই পুরস্কার নিন ।
বিশ্ব অবাক হৃদয় মেলে
মুগ্ধ চোখে চায়,
এ কোন্ অচিন সুর বাজে আজ
কবির এ বীণায় !
দুঃখ দৈন্যে ভরা যে দেশ,
অন্তরে সে ধনী,
জগৎসভায় ছড়ালো তাব
অমৃতময় বাণী ।
চিরকালের পটে এবার
ফুটলো নতুন ছবি,
বাংলাদেশের রবি হলেন
বিশ্বজনের কবি ।






নোবেল পুরস্কারের স্বর্ণপদক ও মানপত্র

৩৩

এই পৃথিবী সসাগরা
বিশাল বিপুল মনোহরা,
কত শহর নগর কত
দেশ মহাদেশ দিয়ে গড়া।
পুব পশ্চিম দু'পিঠে তার
চলছে খেলা আলো ছায়ার,
এ পিঠে তার উঠলে সূর্য
ওপিঠ ঘিরে ঘনায় আঁধার।
আমাদের এই পুবের রবি,
কবি তো সে সবার কবি,
তাঁর প্রতিভার আলোয় আলো
একই কালে হয় যে সবি।
নিত্যকালের বাণী বয়ে
সাত সমুদ্দুর পার হয়ে
বিশ্বপথিক কবি চলেন
বিশ্বব্যাপী দিগ্বিজয়ে।
সুদূর বিলেত আমেরিকায়
জার্মানি ফ্রান্স ইটালিয়ায়
মিশর ইরান তুরান জাপান
পারস্য চীন আর রাশিয়ায়।
যখন কবি যেখানে যান,
খাতির যেন রাজার সমান।
রাজার সেরা কবির রাজা,
এমন খাতির আর কেবা পান!
যেখানে যান, দলে দলে
নারী পুরুষ ছুটে চলে
কী দুর্নিবার আকর্ষণে,
কী যেন এক মন্ত্র বলে!

যেখানে যান, জাগে সাড়া,
প্রাণের ভিতর গভীর নাড়া,
আর কখনো কেউ দেখে নি
এমন মানুষ হৃদয়-কাড়া !
মুগ্ধ সবাই দেখে সে রূপ,
বাণী শুনে বিস্ময়ে চুপ,
সে যেন কোন্ দৈববাণী
শোনে সারা পশ্চিম ও পূব।
কবি, না কোন্ আর্যঋষি !
অথবা কোন্ দেবদূত-ই !
বাণী তাঁহার মন্ত্রসমান
প্রাণে মনে যায় যে মিশি।
লোভ লালসা হিংসা মাতাল
এই দুনিয়া উথাল পাথাল,
মানব-পশুর হুহুঙ্কারে
উঠছে ভরে আকাশ পাতাল
সেই অশুভের দুর্বিপাকে
হারায় প্রাণের দেবতাকে
অহঙ্কারে অন্ধ যারা,
মোহের খাঁচায় বন্ধ থাকে।
তারা যেন হয় সাবধান।
বিশ্বজনে কবি শোনান
সহজ সরল সত্য ভরা
মানব-মনের শাশ্বত গান।
কবির উদার ভালোবাসায়
সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ ভাসায়,
দেশের কালের গণ্ডি টুটে
বিশ্বমানব এক হয়ে যায়।

৩৪

এই যে আমার দেখছো পাকা দাড়ি,
তা বলে নই মোটেই বুড়ো ধাড়ি!
এটা আমার মুখোশ বলে জেনো।
পরি এটা বাইরে যেতে হলে,
নইলে আমি ঠিক তোমাদের দলে—
একই রকম ছেলেমানুষ যেনো।
বলেন কবি ছোটদের এক সভায়
একটুও নেই সন্দেহ তাঁর কথায়,
সত্যি তিনি চিরকালের শিশু।
সকাল দুপুর অথবা বিকালে
রবির বয়স বাড়ে কি কোন কালে?
কবির মনের বয়সও নেই কিছু



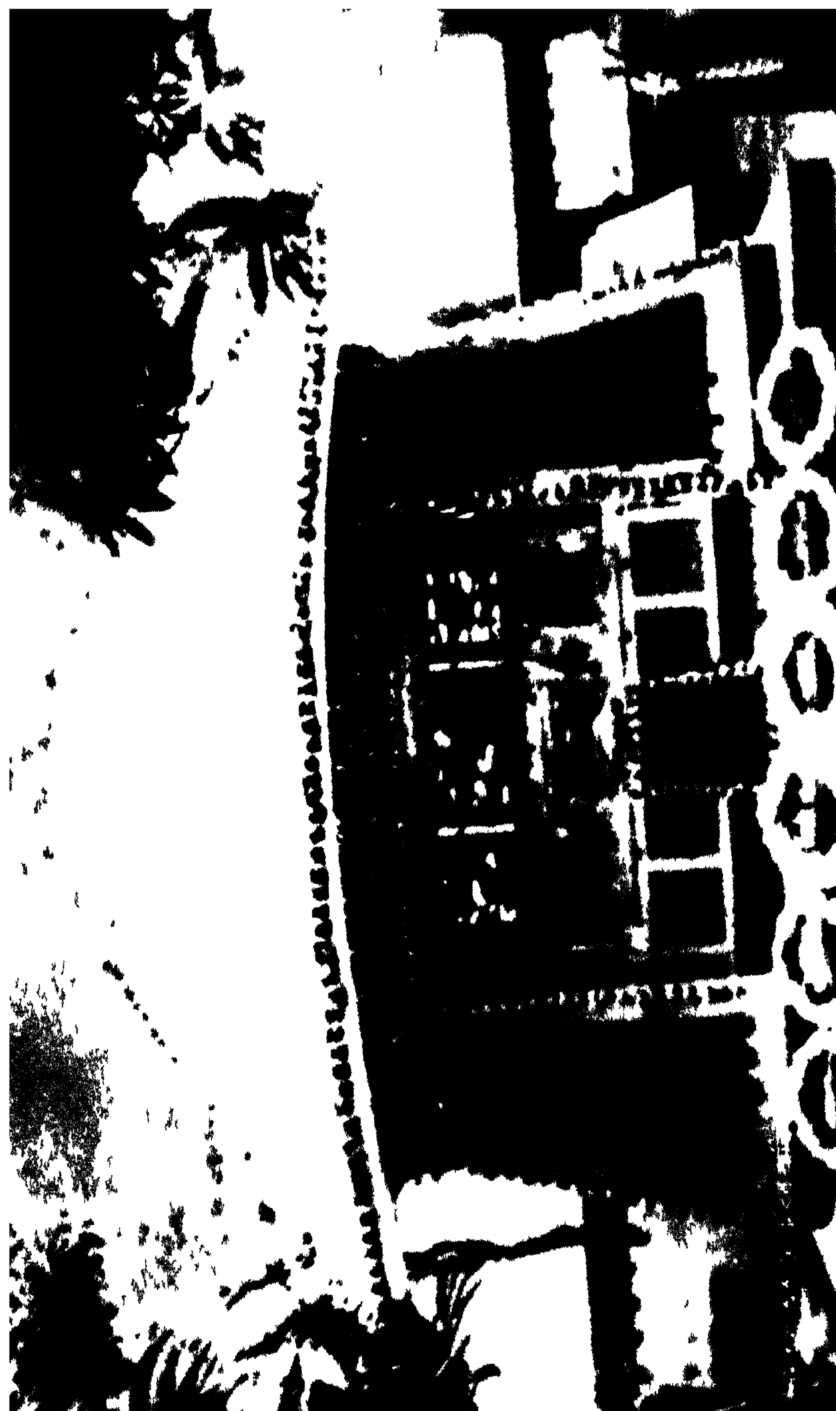
৩৫

ছোট্ট থেকেই বিশ্রীরকম
সুস্থ ছিল শরীরখানা।
পড়ায় ফাঁকি দেবার তালে
তখন রবির চেষ্টা নানা
অসুখ-বিসুখ বাধিয়ে তোলার,
ভিজিয়ে জলে জুতো জোড়া
সারাটা দিন পায়ে দিয়ে
চলতো কেবল ঘোরাফেরা।
কার্তিকে হেমন্ত রাতে
খোলা ছাদে খালি গায়ে
সারা রাত্তির থাকতো শুয়ে
আচ্ছা রকম হিম লাগিয়ে।
হায়রে এমন কপাল খারাপ,
কোথায় ঠাণ্ডা, কোথায় বা কি!
একটুও নেই সর্দি বা জ্বর,
হতে কি নেই একটু কাসি?
মাথাধরা, পেটের ব্যথা—
তার দেখাই বা কোথায় মেলে?
বেজায় রকম রাগ হতো—এই
শরীরটা কি বেআক্কেলে!

মজবুত সে নিরোগ শরীর
শেষ বয়সে পড়লো ভেঙে,
নানান উপসর্গ জোটে,
এটা ওটা রয় যে লেগে।
বিষম অসুখ বাধলো শেষে,
কবির তখন বয়স আশি,
কিছুতে আর রোগ সারে না,
এ কি কাণ্ড সর্বনাশী !
অনেক ওষুধ, অনেক বিষুধ,
ডাক্তারদের শেষ বিধান—
অন্য কোনো নেই তো উপায়,
করতে হবে অপারেশান।
কবিকে তাই চললো নিয়ে
জোড়াসাঁকোর বাসভবনে,
কে জানে আর ফেরেন কিনা
সাধের শান্তিনিকেতনে !
কবিও বুঝি অশ্রু মোছেন
চোখে রুমাল চাপার ছলে,
শান্তিনিকেতনের মানুষ
বিদায় জানায় চোখের জলে
সবার মনে শঙ্কা ঘনায়,
রবি কি আজ অস্তগামী ?
উদ্বেগ আর আকুলতায়
প্রহর কাটে দিবাযামী।

৩৬

দিনের শেষে সূর্যি নামে পাটে,
সন্ধ্যা ঘনায় কবির জীবন নাটে।
উদয় যাহার পঁচিশে বৈশাখ,
চির নূতন যে দিয়েছে ডাক,
রঙে রঙে রাঙিয়ে সে গগন
অস্তে নামে বাইশে শ্রাবণ ;
বিদায় রবি, বিদায় কবিবর !
শেষ প্রণতি তোমার পায়ের পর।
সীমার মাঝে অসীম তুমি, তাই
মধুর, তোমার শেষ খুঁজে না পাই।
তুমি তো নাই, তোমার সোনার তরী
সোনার ধানে রয়েছে আজো ভরি।
দুঃখে সুখে আজো মনের মাঝে
তোমারি গান অশেষ হয়ে বাজে ;
নিত্য তোমায় চিত্ত ভরে স্মরি,
জীবন মরণ আছো হরণ করি।
আবার দেখা দিক না, হে নূতন,
জন্মের সেই প্রথম শুভক্ষণ !



সংক্ষিপ্ত বংশলতিকা



দ্বারকানাথ ঠাকুর
১৭৯৪—১৮৪৬

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮১৭—১৯০৫
সারদা দেবী

অন্যান্য পুত্রকন্যা

১· কন্যাসন্তান
২· দ্বিজেন্দ্রনাথ
৩· সত্যেন্দ্রনাথ
৪· হেমেন্দ্রনাথ
৫· বীরেন্দ্রনাথ
৬· সৌদামিনী
৭· জ্যোতিরিন্দ্রনাথ [কাদম্বরী দেবী]
৮· সুকুমারী
৯· পুণ্যেন্দ্রনাথ
১০· শরৎকুমারী
১১· স্বর্ণকুমারী
১২· বর্ণকুমারী
১৩· সোমেন্দ্রনাথ

১৪· রবীন্দ্রনাথ
১৮৬১—১৯৪১
মৃণালিনী দেবী

১৫· বুধেন্দ্রনাথ

১· মাধুরীলতা　২ রথীন্দ্রনাথ　৩ রেণুকা　৪· মীরা　৫· শমীন্দ্রনাথ

কবির সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

১৮৬১	:	১২৬৮ বঙ্গাব্দে ২৫শে বৈশাখ সোমবার রাত ২-৩৮ মিনিটে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কবির জন্ম। পাশ্চাত্য মতে ৭ই মে, মঙ্গলবার।
১৮৬৫	:	প্রথমে বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে বিদ্যাশিক্ষার সূত্রপাত। কিছুদিন পরে বিদ্যালয়-জীবন আরম্ভ।
১৮৬৮	:	জ্যোতিদাদার বিবাহ ও নববধূ কাদম্বরী দেবীর আগমন। কবিতা রচনায় হাতে খড়ি।
১৮৭৩	:	উপনয়ন। পিতার সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণ।
১৮৭৪	:	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রথম মুদ্রিত কবিতা প্রকাশ—'অভিলাষ'।
১৮৭৫	:	প্রথম মৃত্যুশোক। মায়ের মৃত্যু।
১৮৭৮	:	প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবি কাহিনী' প্রকাশ। প্রথম বিলাত যাত্রা।
১৮৮৩	:	মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহ।
১৮৮৪	:	নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু।
১৮৮৯	:	জমিদারির ভার নিয়ে সপরিবারে শিলাইদহে যাত্রা।
১৮৯৯	:	শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
১৯০২	:	মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু।
১৯০৩	:	দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকার মৃত্যু।
১৯০৫	:	পিতার মৃত্যু। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান ও রাখীবন্ধন উৎসব পালন।
১৯০৭	:	কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু।
১৯১২	:	কবির পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কলিকাতা টাউন হলে সম্বর্ধনা। পুনরায় বিলাত যাত্রা। শিল্পী রোদেনস্টাইন, কবি ইয়েটস্ প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে পরিচয়।
১৯১৩	:	ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে ডি· লিট· উপাধি প্রদান।

১৯১৫ : ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক কবিকে 'স্যার' উপাধি প্রদান।

১৯১৬ : জাপান ভ্রমণ ও বিপুল সম্বর্ধনা লাভ। আমেরিকা যাত্রা।

১৯১৮ : প্রথমা কন্যা মাধুরীলতার মৃত্যু। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

১৯১৯ : জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'স্যার' উপাধি বর্জন।

১৯২০-২১ : ইউরোপ যাত্রা। ইংল্যান্ড, প্যারিস, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, নিউইয়র্ক, হার্বার্ট, শিকাগো, জার্মান, ডেনমার্ক প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ ও বক্তৃতা দান।

১৯২৪ : চীন ও জাপান ভ্রমণ। দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা।

১৯২৬ : গান্ধীজীর শান্তিনিকেতনে আগমন। বৃক্ষরোপণ উৎসব উদযাপন। সুইডেন, বার্লিন, ইটালি, হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া পরিভ্রমণ। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৯২৭ : পশ্চিম ভারত ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণ।

১৯২৯ : কানাডা, জাপান ও ভিয়েৎনাম সফর।

১৯৩০ : শেষবার ইউরোপ যাত্রা। প্যারিসে কবির প্রথম চিত্র প্রদর্শনী। ফরাসি রেডিওতে বক্তৃতা। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা। লন্ডনে চিত্র প্রদর্শনী। জার্মানী, সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা ভ্রমণ। মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির সম্বর্ধনা। জেনিভায় 'আন্তর্জাতিকতাবাদ' সম্পর্কে বক্তৃতা। ভারতে বৃটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে লন্ডনের বিভিন্ন স্থানে কবির প্রতিবাদ।

১৯৩১ : কবির সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' অনুষ্ঠান। স্বদেশে প্রথম চিত্র-প্রদর্শনী।

১৯৩২ : পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্বর্ধনা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' পদ গ্রহণ। একমাত্র দৌহিত্র নীতিন্দ্রের মৃত্যু।

১৯৩৩ : বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা বিভিন্নস্থানে নৃত্যনাট্যের অভিনয় এবং বক্তৃতা দান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কমলা বক্তৃতা' প্রদান।



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৩৫ : বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৩৬ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৩৭ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দান।

১৯৩৮ : ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৩৯ : নেতাজী পরিকল্পিত মহাজাতি সদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন। মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন।

১৯৪০ : অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৪১ : ত্রিপুরার মহারাজা কর্তৃক কবিকে 'ভারত ভাস্কর' উপাধি প্রদান। অসুস্থ কবিকে চিকিৎসার জন্য শান্তিনিকেতন থেকে জোড়াসাঁকোয় আনয়ন। ৩০ জুলাই অপারেশনের কিছুক্ষণ আগে মুখে মুখে শেষ কবিতা রচনা।
৭ আগস্ট, বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ২২শে শ্রাবণ রাখী পূর্ণিমার দিন বেলা ১২-১০ মিনিটে জোড়াসাঁকোর মহর্ষি ভবনে কবির মহাপ্রয়াণ এবং ঐদিন সন্ধ্যায় নিমতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্য অনুষ্ঠান।



সংক্ষিপ্ত রবীন্দ্র-রচনা পঞ্জী

২০ বছর বয়সের মধ্যে রচিত :

কাব্যগ্রন্থ : কবিকাহিনী, বনফুল, ভগ্নহৃদয়, সন্ধ্যাসঙ্গীত।

পত্রসাহিত্য : য়ুরোপযাত্রীর পত্র।

৩০ বছর বয়সের মধ্যে রচিত :

কাব্যগ্রন্থ : প্রভাত সঙ্গীত, ছবি ও গান, শৈশব সঙ্গীত, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, কড়ি ও কোমল, মানসী।

গীতিনাট্য : বাল্মীকি প্রতিভা, কালমৃগয়া, মায়ার খেলা।

নাটক : নলিনী, রাজা ও রানী, বিসর্জন।

উপন্যাস : বৌঠাকুরাণীর হাট।

গান : রবিচ্ছায়া।

৪০ বছর বয়সের মধ্যে রচিত :

কাব্যগ্রন্থ : সোনার তরী, চিত্রা, কণিকা, কথা ও কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য।

কাব্যনাট্য ও নাটক : চিত্রাঙ্গদা, গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা।

ছোটগল্প : গল্পগুচ্ছ-১ম খণ্ড।

পত্রসাহিত্য : য়ুরোপযাত্রী ডায়েরি।

৫০ বছর বয়সের মধ্যে রচিত :

কাব্যগ্রন্থ : স্বদেশ, স্মরণ, খেয়া, শিশু, গীতাঞ্জলি, চয়নিকা (সংকলন)।

নাটক : হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গকৌতুক, শারদোৎসব, মুকুট, প্রায়শ্চিত্ত, রাজা।

উপন্যাস : চোখের বালি, নৌকাডুবি, গোরা।

প্রবন্ধ : চরিত্র পূজা, প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, লোকসাহিত্য, শান্তিনিকেতন।

৬০ বছর বয়সের মধ্যে রচিত :

কাব্যগ্রন্থ : চৈতালি, উৎসর্গ, গীতিমাল্য, গীতালি, বলাকা, পলাতকা।

নাটক : ডাকঘর, অচলায়তন, অরূপরতন, ঋণশোধ।

উপন্যাস : ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ।

প্রবন্ধ : শান্তিনিকেতন।

পত্রসাহিত্য : ছিন্নপত্র, জাপান যাত্রী।

আত্মকথা : জীবনস্মৃতি।

৭০ বছর বয়সের মধ্যে রচিত :

কাব্যগ্রন্থ শিশু ভোলানাথ, পূরবী, লেখন, মহুয়া, বনবাণী, সঞ্চয়িতা (সংকলন)।
নাটক মুক্তধারা, গৃহপ্রবেশ, চিরকুমার সভা, নটীর পূজা, রক্তকরবী, শেষরক্ষা, তপতী।
গীতিনাট্য · বসন্ত, ঋতুরঙ্গ, নবীন, শাপমোচন।
উপন্যাস . যোগাযোগ, শেষের কবিতা।
গল্প গল্পগুচ্ছ—২য় ও ৩য় খণ্ড, লিপিকা।
গান গীতবিতান—১ম ও ২য় খণ্ড (সংকলন)।
পত্রসাহিত্য ভানুসিংহের পত্রাবলী, রাশিয়ার চিঠি।

৮০ বছর বয়সের মধ্যে রচিত :

কাব্যগ্রন্থ পরিশেষ, পুনশ্চ, শেষসপ্তক, বীথিকা, পত্রপুট, শ্যামলী, প্রান্তিক, সেঁজুতি, আকাশ প্রদীপ, নবজাতক, সানাই, রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে।
ছোটদের জন্য ছড়া খাপছাড়া, ছড়ার ছবি।
গল্প সে, গল্পসল্প।
স্মৃতিকথা ছেলেবেলা।
জ্ঞানবিজ্ঞান বিশ্বপরিচয়।
নাটক কালের যাত্রা, বাঁশরী, তাসের দেশ।
গীতি ও নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা, শ্রাবণ গাথা, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা।
উপন্যাস দুই বোন, মালঞ্চ, চার অধ্যায়।
ছোটগল্প তিন সঙ্গী।
প্রবন্ধ সাহিত্যের পথে, কালান্তর, পথে ও পথের প্রান্তে, ছন্দ, বাংলাভাষা পরিচয়, সভ্যতার সঙ্কট।

মৃত্যুর পর প্রকাশিত ·

কাব্যগ্রন্থ ছড়া, শেষ লেখা, স্ফুলিঙ্গ, বৈকালী।
প্রবন্ধ আত্মপরিচয়, সাহিত্যের স্বরূপ, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, বুদ্ধদেব, খৃষ্ট ইত্যাদি।